

কি দেখার কথা কি দেখছি

মো: আলী আজম

মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যোয়ানের যাবজ্জীবন কারাদন্ড ঘোষিত হলে রেগে মেগে কৈফিয়ত তলব করলেন দখলদার ইংরেজ সেনা প্রধান। “এখনও সে আমাদের হাতের মুঠোয়, যখন তখন যা খুশী সাজা তাকে দিতে পারি” এই বলে ইংরেজদের আশ্বস্ত করলেন পক্ষপাতদুষ্ট ফরাসী ধর্মযাজকদের বিচার সভার প্রধান। তারপর যোয়ানকে কিভাবে পুরুষ কয়েদিদের পোষাক পরিধানে বাধ্য করে আবার সেই অপরাধে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় সে ইতিহাস সবার জানা। ক্ষমতা এবং দুর্নীতি যেমন হাত ধরাধরি করে চলে, তেমনি দুর্নীতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও সমকালীন ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছা অনিচ্ছার নিরিখেই মূল্যায়িত হয়। জনতার মুখে ইতিহাসের শেষ রায় প্রত্যক্ষ করার সময় সুযোগ অনেকেরই হয়না। আর এভাবেই ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি করে নিত্য নুতন আঙিকে। ইতিহাসের এই স্রোতধারায় ভলগা থেকে পদ্মার কোন ভেদ নেই। স্বরণকালের নিকৃষ্টতম সরকারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহা ঐক্যজোটের ব্যানারে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদলে বাঙ্গালীর রক্তরোধের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রক্ষমতার চলতি দায়িত্বে আসে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। পরিস্থিতি প্রেক্ষাপটে, সীমাহীন বঞ্চিত-বিক্ষুব্ধ জনগনের প্রত্যাশা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দিষ্ট কার্য পরিধির বাইরে অনেক অনেক বেশী। পরিবর্তনকে আরো অর্থবহ করার নামে সরকারও আগ বাড়িয়ে এটা সেটা আরও বেশী কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে নেয়। তাদের সব কাজে সন্তুষ্ট না হলেও ভবিষ্যত সমৃদ্ধির আশায় বর্তমান কষ্টকে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখে জনগন। জরুরী বিধিমালায় ঘেরাটোপ থেকে ইতি উতি বেরিয়ে আসা অসন্তোষের জবাবে সরকার নিজের মত করে সাফাই দেন তারা কেন এবং কি করতে অথবা না করতে ক্ষমতায় এসেছেন ইত্যাদি। প্রশ্ন উঠতে থাকে জনতার আন্দোলনের ফসলই যদি না হয় এই সরকার তাহলে তারা কার ম্যুন্ডেট নিয়ে এসেছেন এবং কার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছেন? কথা ও কাজের রহস্যময়তার মধ্য দিয়ে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ঘটনা প্রবাহ ঘটে চলেছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের খবচিত্রগুলো এভাবে সাজানো যায়-আমেরিকায় খুশী মহিউদ্দিনের আপীল খারিজ হয়ে যাওয়াতে তাকে প্রত্যর্পনের জন্যে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র। মহিউদ্দিন পরিবার শেষ চেষ্টা চালাচ্ছে প্রত্যর্পন ঠেকাতে কিন্তু বাংলাদেশ তার নাগরিক কিংবা দন্ডপ্রাপ্ত পলাতক কোন বিবেচনাতেই উচ্চবাচ্য করছেননা।

আব্দুল জলিল,শেখ সেলিম, মির্জুরা আটক হলেন এবং জে আই সিতে তথাকথিত স্বীকারোক্তি দিলেন। দেশের কিছু প্রিন্ট মিডিয়া তা ছাপালো,ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমও তা লুফে নিল। পতিত জোট পহীরা পত্রিকার ফটোকপি বিলাতে শুরু করলো। “স্বীকারোক্তি”কে তথাকথিত ঠাউরাবার কারনটা পরে বলাছি আপাততঃ দৃশ্যপট পরিষ্কার করে নেয়া যাক।

খালেদা জিয়া তার রাজনীতির সখা নিজামীর সাথে দেখা করতে গেলেন হাসপাতালে, অনেক দিন পর তাঁর আরক্তিম মুখ দেখা গেল। ভাবখানা এমন, ‘বাঘ মারতে শত্রু পাঠালাম যে মরে মরুক’ দূতরফেই লাভ।

আইন ব্যবসায়ী ডঃ কামাল হোসেন জাতীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

নবম ডিভিশনের জিওসি মহোদয় কোন এক স্থানীয় সমিতির সভায় বেশ বাগাড়াম্বর করলেন।

দেশ উদ্ধারে সাদেক সিদ্দিকীর মত মস্ত রাজনীতিবিদরাও বড্ডো বেশী তৎপরতা দেখাতে শুরু করলেন,কোরেশীতো আছেনই,দেশে ঝড়-বৃষ্টির আলামত দেখা দিলে উইপোকারা যেমন টিবি থেকে বেরিয়ে আসে। প্রধান কিংবা রেহানা প্রধানদের দেখা গেলে পলাশী -উত্তর মুর্শিদাবাদ কাণ্ডের ষোলকলা পূর্ণ হতো বৈকি।

যাহোক পুরো দৃশ্যপট ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে উঠলো জলিল,শেখ সেলিম এবং মির্জুর কথিত স্বীকারোক্তি সূত্রে শেখ হাসিনার চরিত্র হননের চেষ্টা। শোনা যায় বাজারে তার সিডিও বেরিয়ে গেছে। মনে পড়ে,আমাদের পুত পরিদ্র ‘অস্বাভাবিক সরকারের’ এক উপদেষ্টা একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘সাভাস বাংলাদেশ’র সিডি বিতরণের সফল মিশন চালিয়েছিলেন।

বাংলাদেশে এখন ত্রসফায়ার হালাল হয়ে গেছে। কলেররা জনপদে ডায়ারিয়া নমস্য কিনা তাই মানবাধিকার সংগঠন,রাজনৈতিক দল কেউ আর এসব ঠুনকো বিষয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নয়। খুন করার লাইসেন্স পেয়ে যারা রাতকে দিন বানাবার কৃতিত্ব দেখায় তাদের সমগোত্রীয়রা,যারা কিনা আবার বকলনে সরকার, ইন্টারোগেশন সেলে স্বীকারোক্তি আদায়ে এবং পছন্দ মাফিক গল্প প্রচারের কৃতিত্বে পিছিয়ে পড়তে পারেনা। সর্বোপরি বিচারিক কার্যক্রমে এই ধরনের স্বীকারোক্তির মূল্য প্রশ্ন সাপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও যখন তা বাজারে ছেড়ে দেয়া হয় তখন বুঝা যায় পুরো কাণ্ড কারখানার লক্ষ্যটা অন্য কোথাও অন্য কোনখানে অর্থাৎ অবশ্যই আওয়ামী লীগ এবং তার প্রধান শেখ হাসিনা। এ’কথা নুতন নয় যে,বাংলাদেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে মোটামুটি ত্রিযাশীল এমন কোন রাজনৈতিক দল এবং তাদের নেতা নেত্রীকে কেউই ধোয়া তুলশী পাতা মনে করেনা, যদিও পরিচ্ছন্নতার মাত্রাভেদ জানেন সবাই।

এখানে ডঃ কামাল হোসেন এর ক্ষমা চাওয়ার কথাটাও চলে আসে। জলিলের ‘স্বীকারোক্তি’র চেয়েও ডঃ কামালের ক্ষমা চাওয়াটা দূশতঃ আওয়ামী লীগ এবং তার প্রধান শেখ হাসিনাকে বেশী বেকায়দায় ফেলেছে অন্ততঃ তাৎক্ষণিকভাবে। এই বেকায়দায় পড়াটা আবার যতটানা জাতির কাছে তারও বেশী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কাছে। কথাটা অন্যভাবেও বলা যায়- আওয়ামী লীগ যতটা না বেকায়দায়

পড়েছে তারচেয়েও ঢের বেশী বেনিফিট অফ ডাউট'র সুবিধা ভোগের উপলক্ষ্য পেয়েছে পতিত জোট সমর্থকেরা। ‘স্বীকারোক্তি’ যথার্থ ধরে নিলে ‘দুর্নীতিতে তারা একা চ্যাম্পিয়ন’ নয় অথবা তা কারসাজি মূলক হলে জলিল পর্বের মত তারেক-গংদের বিষয়টাও সাজানো। সব মিলিয়ে ন্যাংটার বাটপাড়ের ভয় আর থাকলোনা। মাঝখানে নোবেলের তোড়ে অতি আশাবাদী ডঃ ইউনুস অল্লেই বুঝ পেয়ে ক্ষান্ত দিলেন। আর এবার ডঃ কামাল পবিত্র মানসে অজু করতে নেমে প্রমান করলেন রাজনীতিতে তাঁর শেষ গোসল ফরজ হয়েছে অনেক আগে।

রাজনৈতিক অঙ্গন ছেড়ে সামাজিক স্তরে দুর্নীতির প্রতি মানুষের মনোভাব নিয়ে কিছু কথা হোক। পাপের ভাল-মন্দ শ্রেণী বিন্যাস করা যায়না ঠিকই কিন্তু আকছার লম্বু-গুরু ঠাহর করা যায় এবং পঁচাত্তর পরবর্তী দেশপ্রেমিক জেনারেল জিয়া-এরশাদ এন্ড কোংএর কিল-গুঁতা খেয়ে,সময় প্রবাহে বর্ধিত সংস্করণের সেই পাঠ বাঙ্গালী ভালভাবেই নিয়েছে। হোক স্থূল,একটা উদাহরণ দেয়া যাক-- দেশের দরগাহ,মাজার গুলোতে পীরের ওয়ারিশ নামধারী গদ্দিনশীন, মোতওয়াল্লী, খাদেম, ভিখিরী এবং পকেটমার,মাস্তান এরকম অনেক সুযোগ সন্ধানী,সুবিধাভোগী থাকে। এদের সবার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য একই হওয়া স্বত্বেও এদের অপরাধের বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি ভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন। কোন কোন পাপকে মানুষ সাধুবাদ দেয় কেন? একেবারে সাম্প্রতিক সময়ের ব্যক্তিগত উদাহরণ--জোট সরকারের আমলেও বিদেশ থেকে প্রবাসীর লাশ পাঠাতে গিয়ে দেখা যেত দুর্নীতি পরায়ন আমলাদের একটু তোষামোদ করলে লাশের টিকেট তো বটেই কফিন বাস্ত্রের খরচটাও বেঁচে যায়, সাত আট দিনের মাথায় লাশ ঘরে ফিরে। ফাঁক-ফোকরে আমলারাও কিছু জুটিয়ে নেয়। ইদানীং দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্র। লাশের টিকেট এবং তার সহযাত্রীর টিকেটের টাকা নিয়ে এসেও নিয়োগকর্তা কোম্পানী দুতাবাসের অনুমতি পাচ্ছেনা। সেই পুরোনো আমলারাই নিয়ম-কানুন দেখিয়ে বলছে মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দুতাবাস ফ্যাক্স করেছে মন্ত্রণালয়ে, সেখান থেকে কেউ যাবে লাশের ওয়ারিশের কাছে, রিপোর্ট পাঠাবেন জনশক্তি হয়ে মন্ত্রণালয়ে, ওরা পাল্টা ফ্যাক্স করবে দুতাবাসে। তারপর বিমানে লাশ বহনের অনুমতি। কোনভাবেই এর অন্যথা হওয়ার নয়। এভাবে ১৯ তারিখের মরা দেশে পৌছায় ৪ তারিখে। এই আমলাদের আগের দুর্নীতিকে মহান পাপ না বলে উপায় আছে?

যাহোক আবার ‘স্বীকারোক্তি’ প্রসঙ্গে আসা যাক- অসংস্কৃত মিটু তার আঞ্চলিকতা দৃষ্ট বাচনভঙ্গীতে টেলিভিশনের টকশোতে এর চেয়েও ঢের বেশী কথা বলতো। তবে কিনা সে বেগমকেও ছেড়ে বলতোনা। এবার সে একপেশে। ব্যবসায়ী মানুষতো চলতি বাজারে কথার চাহিদাও বুঝেছে বৈকি। শেখ সেলিম বললেনতো অনেকই তবে মোদা কথাটা চমৎকার-‘শেখ হাসিনা বেশী কথা বলেন।’ এই বক্তব্যটাই উৎসাহীদের পুরো আয়োজন ধ্বংস করে দিয়েছে। শেখ হাসিনার চ্যাটিং চ্যাটিং কথাগুলো জোট পন্থীদের গা জ্বালাতো। এখন সঙ্গত কারনেই মনে হয় ইন্টারোগেশন সেলের উদ্যোক্তাদের মধ্যেও সেই জ্বলুনি আছে।

তৈরী পোষাক শিল্পের অস্থির সময়ে মোশররফা মিশুর নামে প্রকাশ্যে বিবোদগার করতো এফ বিসি সি আই নেতারা। বুট ব্যবসায়ী যুবদল নেতার নাম বেরিয়েছিল সেই জোট সরকারের আমলেই। এখন কামাল মজুমদারের নামটা আনা গেলে মীরপুর নিরক্ষুশ দখলে আনা যায়। ওদিকে এস এ খালেকও নেই। সুতরাং ভবিষ্যত ব্যালটের মাঠও খালি ভাবে পাবেন কেউ কেউ।

লাগামহীন দ্রব্যমূল্য নিয়ে জোট স্টাইলে ‘আন্তর্জাতিক বাজার’,ত্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি’ ফালতু অজুহাত কাজে লাগছেনা বুঝতে পেরেছে সরকার আর তাই এখানেও আওয়ামী লীগকে ফাঁসিয়ে দেয়া গেলে জোট চরিত্র বজায় থাকে। নাসিরুদ্দিন, থুড়ি আলহাজ্ব নাসিরুদ্দিন পিটুর রাজত্ব কামরাঙ্গীর চরে স্বদর্পে ঠিকে থাকা হাজী সেলিম আওয়ামী লীগের পাঁচ বছর রেয়াত দিয়ে জোট আমল এমনকি দোর্দণ্ড প্রতাপের তড়াবধায়ক সরকারের আমলেও দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে চলেছে! জঞ্জাল সাফ করতে এসে জঞ্জালের দায়ভার নেয়ার কথা ছিলনা এই সরকারের। দোষারোপের খেলায় পদে পদে বিগত জোট সরকারের ছায়ায় চলতে গিয়ে নিজেদের ব্যর্থতায় পতিত জোটের প্রতি মানুষের সহানুভূতি জাগিয়ে তুলছে। আর কিল খেয়ে কিল হজম করাই যেন আওয়ামী লীগের বিধিলিপি হয়ে উঠেছে।

আব্দুল জলিল কোনরকম রাখঢাক না করেই মার্কেটাইল ব্যাংকে অফিস করতেন। যেমন ইউনিফর্মধারী অনেকে ট্রাস্ট ব্যাংকের বোর্ড মিটিংয়ে নেতৃত্ব দেন। তবুও রাজনীতিকে যারা ব্রত হিসেবে দেখতে অভ্যস্থ তাদের কাছে জলিলের এ দৃশ্য কখনও ভাল ঠেকেনি। এইটুকু লোভের দায় জলিলকে নিতেই হবে। কিন্তু প্রশ্ন থাকে- সংশ্লিষ্ট ব্যাংক,বাংলাদেশ ব্যাংক,স্টক এক্সচেঞ্জ রেগুলেটরী কমিশনে খোঁজ নিলেই কি ওই প্রতিষ্ঠানে জলিলের মালিকানার উৎস বিশদে পাওয়া যেতনা? জলিলকে মালিকানা দিয়ে ওই ব্যাংক রাষ্ট্র থেকে কি কি অবৈধ সুবিধা আদায় করে নিয়েছে তাকি বাংলাদেশ ব্যাংক জানবেনা? যারা ‘স্বীকারোক্তি’ নিয়েছেন এবং প্রচার করেছেন তারা কিন্তু এই বিষয়ে তেমন গুরুত্বারোপ করেননি। করবেনই বা কেন তারা তো দুর্নীতি খুঁজতে চাননি,তাঁরা চেয়েছেন আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনাকে ধ্বংস করে দেয়। ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা প্রভাবের মাধ্যমে স্বার্থ উদ্ধার অবশ্যই অনৈতিক,অন্যায়। দৈবচয়নের ভিত্তিতে সন্তোষের যে কোন দিনের ইত্তেফাক হাতে নিলেই দেখা যাবে অন্তত: চার পাতা জুড়ে সরকারী বিজ্ঞাপন। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রতিটি সরকারের সাথেই ইত্তেফাক মালিকদের কারুর না কারুর সংশ্লিষ্টতার সুবাদে এই নিরবচ্ছিন্ন উপার্জন কি শতভাগ হালাল বলা যাবে? ইত্তেফাক পরিবারের কাউকে জে আই সিতে নিয়ে তার মুখ দিয়েও তো বের করান সম্ভব যে, ইত্তেফাকের মালিকানা নির্ভেজাল নয়। বিজ্ঞাপন ব্যবসা স্বচ্ছ নয়।

ওয়ারিদ টেলিকম থেকে বাবরের বহুমিলিয়ন ডলার ঘুষ নেয়ার বিপরীতে চার চারটি মোবাইল কোম্পানীকে আওয়ামী লীগ সরকার বিনা পয়সায় লাইসেন্স দিয়েছিল (এক মোবাইল কোম্পানীর মালিক তৎকালীন বি এন পি নেতা প্রকাশ্যে বলেছিলেন এত বড় কাজে তাকে এক পয়সাও খরচ করতে হয়নি। অপর সুবিধাভোগী, হাল আমলের নোবেল বিজয়ী কিন্তু সেদিন কোন বাক্য ব্যয় করেননি) এই স্মৃতি কি খুব বেশী পুরোনো? ‘সবাই পাপ করিয়াছে’ এটা মেনে নিয়েও, এই একটি মাত্র উদাহরণই কি দুর্নীতির মাত্রা, দুর্নীতির প্রতি আসক্তি ইত্যাদি বিচারের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের একটা অবস্থান নির্দেশ করেনা? ‘অস্বাভাবিক সরকার’ এবং তার আশ্রয়ে অন্যরকম খোয়াব দেখার সুশীলরা যা ভাবার ভাবুন বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু এই মাত্রা ভেদ ভালভাবেই জানে। এবং জানে বলেই বার বার রুখে দাঁড়ায়, ঘটনা চক্রে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এবং আওয়ামী লীগও পাঁচাত্তর পরবর্তী প্রতিটি বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

বলাবাহুল্য পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপটে চূপ করে থাকলেও, সমাজের একটা বড় অংশ আজ বহুল আলোচিত ১/১১ পরবর্তী সরকারী কর্মকাণ্ডকে ভিন্নদৃষ্টিতে দেখছে। অনস্বীকার্য যে, দেশের মানুষ যখন দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে, যখন বাস্তব দুর্গের মত হাওয়া ভবনের প্রতিটি ইট খুলে নেয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছিল, (এবং যে পরিণতি আঁচ করতে পেরে খালেদা জিয়া আগে থেকেই তার গাট্টা গোটা গোল করে সোদিয়া-দুবাইতে পাচার করেছিল) তখনই এই সরকারের আবির্ভাব। সরকারের উদ্যোক্তা-- গাফফার চৌধুরীর ভাষায় ‘থার্ড কলটিটিউন্সি।’ আর উদ্যোগের সমর্থক- ‘দুই নেত্রী, দুই দল ইত্যাদি শব্দবন্ধের আড়ালে যারা বরাবরের সুবিধাভোগী। তারেক-মামুনকে গ্রেফতারের নামে গনরোষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। অপশাসক খালেদা বহাল তব্বিতেই আছেন, সমতা দেখানোর জন্যে মাঝে মাঝে প্রচার মাধ্যমে তার বিদেশ যাওয়া না যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে ধুমুজাল সৃষ্টি করা হলেও মূল আক্রমণটা করা হয়েছে শেখ হাসিনাকে। পতিত জোট সরকারের ধারায় যেনতেন মামলা ঠুকে জনকণ্ঠ সম্পাদককে গ্রেফতার, প্রায়শই একটা না একটা অযুহাতে ইটিভির সম্প্রচারে ভজঘট লাগিয়ে রাখার মাজেজা এখন পরিষ্কার। মাইনাস টু ফর্মুলার নামে তারা যে মূলতঃ আওয়ামী লীগ এবং তার প্রধানের বিরুদ্ধে নেমেছেন সেটা প্রকাশ হতেও দেরী লাগেনি। জলিল-সেলিমের ‘স্বীকারোক্তি’ আদায় এবং তা প্রচার কাণ্ডে এটাই প্রমাণ করে। অতএব, এই সব কর্মকাণ্ডকে একটু আগ বাড়িয়ে ১৫ই আগস্ট-২১শে আগস্টের ধারাবাহিকতা না ঠাউরে উপায় কী?

সন্তদের কথা মত, আন্দোলন করে আওয়ামী লীগ যদি অপরাধ করে তাহলে জোট সরকারের সব কর্মকাণ্ডকেই সাধু মেনে নিতে হয়- এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। লঘু-গুরু সব পাপের বিচার যদি করতে হয় তাহলে জাতীয় অরাজকতার উৎসভূমি জিয়া-এরশাদের সাজ-পাঙ্গদেরও বিচারের ব্যবস্থা আবশ্যিক-এটাই নৈতিক বিচার। যে যার পছন্দ মাসিক যাকে ইচ্ছে আগলে রেখে, বেছে বেছে রাজনীতিবিদদের সাইজ করে, মাথা কেটে মাথা ব্যথা কখনও সারেনি, কোনদিন সারবেওনা।

পরিবারতন্ত্র নিয়েও কিছু কথা বলা আবশ্যিক। জোট সরকারের আমলে দেখা তন্ত্রের রূপ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একজন বর্ষীয়ান মহিলা তৈয়বা মজুমদারকেও দেখা গেছে রাষ্ট্রীয় টাকায় মৌমুনী সমাজ সেবক সাজতে। রত্নগর্ভা উপাধি সেতো আরেক চিহ্ন। সমতা বিধানের জন্যে কেউ কেউ শেখ হাসিনার ছেলে জয়কে টেনে এনে সুখ পান। এবং ভাঙতে হলে দুই পরিবারকেই ভাঙার আন্দার করেন। অনস্বীকার্য যে, আওয়ামী লীগে পরিবারতন্ত্র অবশ্যই আছে তবে এটা ঠিক আক্ষরিক পরিবারতন্ত্র নয়। ক্ষমতার ঔরসে ব্যক্তিগত লোভ লালসার গর্ভে এই পরিবারের জন্মও হয়নি। রাজনৈতিক ধারা, পরিবারতন্ত্র ইত্যাদি নামের পরিবর্তে এই সংহতিকে একধরনের গোষ্ঠী তন্ত্র কিংবা সম্প্রদায়ও বলা যেতে পারে- যার নাম আওয়ামী পরিবার। একটি ঐতিহাসিক অবিচারে ক্ষুদ্র, রাষ্ট্রক্ষমতার ছত্র ছায়ায় সেই অবিচারের ধারাবাহিকতায় ভীতশ্রদ্ধ এবং প্রতিকারের ব্যর্থতায় অনুশোচনার সুতিকাগারে এই পরিবারের জন্ম। আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে কি পাবে না পাবে কিংবা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-আদর্শ বিচারের চেয়ে আবেগ এবং একধরনের সহমর্শিতা, একাত্মতাবোধে আবদ্ধ এক বিশাল জনগোষ্ঠী এই পরিবারের সদস্য। সময়ের প্রয়োজনে এদের একাংশকে আমরা লগি-বৈঠা হাতে দেখতে পাই। জরুরী অবস্থার বিপদ আপদ মাথায় নিয়ে গাঁটের টাকা খরচ করে এরা এই সেদিনও দর্শনার্থীর টিকেট কিনে ঢাকা বিমান বন্দরের ছাতে ভীড় জমিয়েছে, রাজপথের কথা না হয় বাদ থাক। আওয়ামী পরিবারের আবেগী সদস্যদের কাছে তাদের আবেগের মূল্যায়নে এবং নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকারের কোন বিকল্প নেই। এবং একই কারনে এই পরিবারের দূরতম সদস্যও শেখ হাসিনার পরিবর্তে, নিদেনপক্ষে তাঁর অনুমোদন ছাড়া আর কাউকে প্রধানের পদে দেখতে প্রস্তুত নয়। পোড় খাওয়া আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তা ভালভাবেই বুঝেন।

তৃতীয় শক্তির উত্থান কামনায় মুখে যতই ফেনা তোলা হোক বাংলাদেশের রাজনীতি মূলতঃ আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী এই দুই শিবিরে বিভক্ত। এই বিভেদ তিক্ততা, শত্রুতা যে নামেই আখ্যায়িত হোক না কেন তার মূলে একাত্তরের পরাজিত শত্রুর উত্থান এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা, পাঁচাত্তরের রক্তাক্ত অধ্যায় মূল বিভাজন রেখা। তার সাথে সময়চক্রে যুক্ত হয়েছে আরও ষড়যন্ত্র, স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংঘাত ইত্যাদিও। মৌলিক বিভাজনের সুরাহা না করে প্রকারান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে দোষী ঠাউরে রাজনৈতিক সংস্কারের নামে দণ্ড বিধান সুবিচারের পর্যায়ে পড়েনা, তার সাফল্যের আশাও সুদূর পরাহত। আওয়ামী পরিবারের আহত আবেগের ক্ষতিপূরণ বিধান ছাড়া আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কাঠামোয় যে কোন সংস্কারের উদ্যোগ তা সে যেখান থেকেই আসুক না কেন ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই বলে কেউ একথা

বলেনা যে, আওয়ামী লীগকে আজই ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়া হোক। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ক্ষমতাসীনদের পক্ষে দেশে ন্যায় বিচার, সুনীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্তত: মৌখিকভাবে হলেওতো অনেক কথা বলা হচ্ছে। ন্যায়দালতের দেয়া বঙ্গবন্ধু হত্যার রায় কার্যকর করে কেউ তার প্রমান দিন না কেন? ৭৫-৯০শাসনামল অবৈধ ঘোষিত আদালতের আরেক রায়কে স্থগিতাদেশের পাথর চাপা থেকে মুক্তি দিলেওতো জাতীয় পাপ মোচন হয়। এসব করতে তো আর সংবিধান বদলাবার অযুহাত থাকেনা,কাউকে রিমান্ড নেয়ার দরকার পড়েনা,ত্রেস ফায়ারের অভিসারও লাগেনা।

সাইড লাইনের চিরদিন কাঁদতে জানা বাঙ্গালীর হাসির গল্পে একের পর এক দোষ কার মার খায় কে,লঘু পাপে শুরু দন্ড,বানরের পিঠা ভাগের উপমা যুক্ত হচ্ছে নিরন্তর। ঘটনা প্রবাহে প্রতীয়মান হচ্ছে জাতির কান্ডিত পরিবর্তনের ট্রেন পাকিস্তানী ট্রাকে এগিয়ে গেছে অনেক দূর। নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে নৌকার ব্যবহারর বারন চাইকি বাধ্যতামূলকভাবে দলের নাম পরিবর্তন করার পরোয়ানা জারীও অসম্ভব নয়। নির্বাচনে লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরীর নামে ভবিষ্যত প্রতিপক্ষ নিধনের আগাম কর্মসূচী বাস্তবায়নের ছায়াও আজ অলীক কল্পনা নয়। সম্ভাব্য যুৎসই নির্বাচনের মাধ্যমে জিতিয়ে আনা মেরুদন্ডহীনদের ঘাড় বসে কি এক কাউন্সিল গঠনের পক্ষে সুশীল সমাজের নামে জনসমর্থনের মহড়া,হুয়া দু:প্রফুল সি প্যাটেলের মারফত বৈদেশিক মোড়লদের সমর্থন এখন প্রায় নিশ্চিত। পনের বছর আঁচলের তলায় থেকে ইদানীং অনুকূল বাতাসে মোল্লারা প্রচার মাধ্যমে মিনমিনে কণ্ঠে বলতে শুরু করেছেন সরকার প্রধান নারী হওয়ার কি কি অসুবিধা। বকলমে সরকার দায়ে ঠেকে আপাতত:স্বরূপে আবির্ভূত হতে ভয় পাচ্ছেন বটে ভবিষ্যত খেলায় যে পাকাপোক্ত অংশ নেবেন তার ইঙ্গিত ইতোমধ্যেই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। পতিত জোটের অনেকেই তাঁদের সাথে লোক দেখানো কসম কিরা কেটে ঘোট পাকাবার নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। পথের কাঁটা বলতে সেই চির চেনা আওয়ামী লীগ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে তাক্ষিল্য কিংবা নিশ্চিহ্ন করে বাংলাদেশের দিনলিপি লেখার চেষ্টা বালখিল্যতা মাত্র। এই যাত্রায় বাঙ্গালী আর কত ভুল করতে পারে আর কত স্বপ্নাহত হতে পারে সেটা যেমন দেখার বিষয় তেমনি আওয়ামী লীগও ইতিহাস ঐতিহ্যের শেষ ইঞ্চি মাটি আঁকড়ে আর কত কিল খেয়ে কিল হজম এবং অথবা প্রতিরোধ গড়তে পারে তাও দেখার সময় বড্ড়া কাছে এসে গেছে।